জল পড়ে পাতা নড়ে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

জল পড়ে পাতা নড়ে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগ

বইটির বিষয়বস্তু আমাদের একেবারে কাছের পরিবেশ নিয়ে। আশেপাশের সেই ছোটখাট ঘটনা যা বড়রা খেয়াল না করলেও ছোটরা অনেক সময় করে। তারা এগুলো খেয়াল করে, কৌতূহলী হয়, খুঁটিয়ে দেখতে চায়। তাদের সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে আরো খবরাখবর দিয়ে বাড়িয়ে দেবার জন্যই এই বই। নিকট পরিবেশের ছোটখাট জিনিস সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে থেকেই বিজ্ঞানে তাদের স্বাভাবিক হাতে খড়ি হবে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ শিশু বইটির মধ্যে তার কিছু উপাদান খুঁজে পাবে আশা করা যায়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র রচনাগুলো মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীতে এই নামের নিয়মিত ফিচার হিসেবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' বইটি বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের একটি উদ্যোগ। কেন্দ্রের উদ্যোগ হিসেবে মুক্তধারার প্রকাশনায় ইতিমধ্যে 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট', 'বিজ্ঞানে বড় মানুষ বড় কাজ', 'আশ্চর্য আর আশ্চর্য', 'কত অজানারে' ইত্যাদি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এদেশের জনসাধারণের চিন্তা ও কাজের কাছাকাছি এনে দেয়াই বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পুস্তকগুলো সেই প্রচেষ্টারই একটি দিক। কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ ৮২৮ রোড ১৯ (পুরানো) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।

সূচীপত্র

জল পড়ে পাতা নড়ে ৭
নদী চলে বাঁকে বাঁকে ১৪
রংধনু ১৮
পতঙ্গ সঙ্গীত ২০
পিঁপড়ার কলোনী ২২
মাছের অনুভূতি ২৪
মাকড়সার জাল ২৬
খাদ্যের চেইন ২৮
ঘাস ৩০
আখ থেকে চিনি ৩২
ছিপির ছোট কর্কটি ৩৪
তোমার চামড়ার নানাকাজ ৩৭

জল পড়ে পাতা নড়ে

জল পড়েছে তো পড়ছেই, পাতা নড়ছে তো নড়ছেই—কেউ কি সেদিকে তাকিয়ে দেখে? তুমি নিশ্চয়ই দেখ, দেখ বলেই তুমি জানতে চাও পানিটা কোত্থেকে আসছে, কেনই বা পড়ছে, পাতাটাই বা নড়ছে কেন? শুধু তাই নয়, পাতাটার উপর যে পোকাটা বসেছে তার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই তোমার কুতূহল আছে। হঠাৎ এক একটা দিন পিঁপড়াগুলো এমন সারি বেঁধে চল্‌লো কোথায়—তা জানতেও তোমার ভারী ইচ্ছে। তাছাড়া তোমার পোষা মুরগীটা হঠাৎ একদিন অসুখ হয়ে মরে গেলে তোমার নিশ্চয়ই ভারী মন খারাপ করে—কি করলে এমনটি আর হবে না, তা জানতে ইচ্ছে করে। ঘরের কত কিছু টুকিটাকিতে তোমার জানার বোঝার ইচ্ছে। শুধু বুঝতে নয়, অনেক কিছু করতেও তোমার মন চায়। বাজারে সে দিন যে

খেলনাটা দেখে এসেছ সে রকম একটা যদি নিজেই তৈরি করতে পারতে! পাশের বাড়ীর ছেলেরা সুন্দর বাগান করেছে। তুমিও দু একটা বীজ বুনতে চাও, চারা লাগাতে চাও, দেখতে চাও, বুঝতে চাও কিভাবে এরা বেড়ে ওঠে।

তোমাকে যে এ সব কিছুতে সাহায্য করতে পারে তারই নাম বিজ্ঞান। অবশ্য সাথে সাথে তোমার চোখ, কান খোলা রাখলে, ভালভাবে একটা জিনিসকে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস করলে, পর্যবেক্ষণ করলে তবেই বিজ্ঞান তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

পানির কথা নিয়েই শুরু করি। জীবন ধারণের জন্য দুনিয়াতে যত জিনিস দরকার তার মধ্যে পানিই সবচেয়ে অপরিহার্য—সে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা যাই হোক না কেন। মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না—এটা জানতে অনেক চেষ্টা চালানো হচ্ছে মহাশূন্য অভিযানের মাধ্যমে। যদি দেখা যায় যে এখানে পানির ছিটে ফোঁটাও নেই, তবে সেখানে কোন আকারে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হতে হবে। এই পৃথিবীতে অবশ্য পানি রয়েছে দেদার—পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ হল পানি দিয়ে ঢাকা।

জীবনের জন্য পানির প্রয়োজন নানা কারণে। একটা বড় কারণ অবশ্য জীবরা নিজেরাই প্রধানত পানি দিয়ে তৈরি! কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার নিজেরই দেহের চার ভাগের তিন ভাগ যে পানি! অনেক প্রাণী আছে যাদের দশ ভাগের ন' ভাগই পানি। এই দেহ বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাই প্রচুর পানির নিত্য দরকার।

আমরা পানি খেয়ে এই পানি পাই। শুধু গ্লাস থেকে পান করে নয়—যাবতীয় খাদ্যের সাথেই এটা আমরা খাই। হাজার হলেও খাদ্য মানে উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পাওয়া খাদ্য তো—তারাও তো বেশির ভাগ পানি।

আমাদের রক্তের বেশির ভাগই পানি। হৃৎপিণ্ডের দ্বারা পাম্প করে এই রক্ত সারাক্ষণ শরীরের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। পানি গরম হতে বা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে অপেক্ষাকৃত বেশি। কাজেই রক্ত চলাচলের ফলে শরীরের সর্বত্র তাপের সমতা বজায় থাকে, শরীরটাও চট করে গরম বা ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে পারে না। জীবন রক্ষার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন, কারণ তাপের তারতম্য হলে শরীরের ভেতরকার নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হঠাৎ বেশি দ্রুত বা ধীর হয় অনর্থ বাধাত।

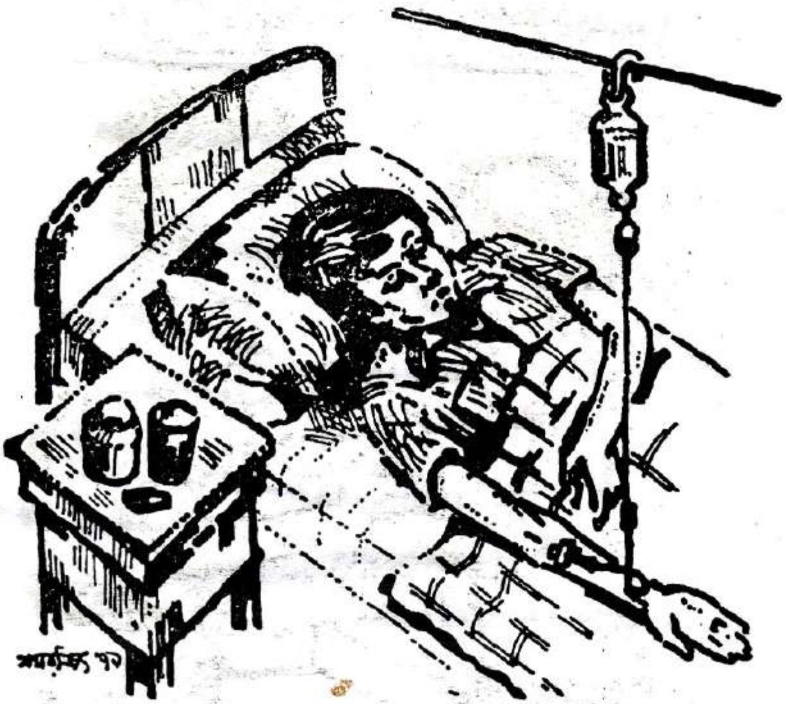

পানিতে একটু নুন বা একটু চিনি ছেড়ে দাও, সাথে সাথে গলে যাবে। এ রকম অসংখ্য জিনিস আছে যা পানিতে গলে যায়। আর তাই শরীরে ভেতরের এত সব বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়—এ সবে অংশ নেয় যে সব জিনিস সবই পানিতে গলা অবস্থায় থাকে, থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের খাদ্য হজম করার ব্যাপারটি ধরা যাক। পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে এমন একটা তরলের ভেতর হজম ক্রিয়াটি ঘটে যার বেশির ভাগই পানি। এই জলীয় অবস্থায় থাকার দরুনই খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে রক্তের মধ্যে অথবা চর্বি হিসেবে চলে যায়। আর রক্তের মধ্যে পানিতে গলানো অবস্থাতেই এরা শরীরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে পৌঁছুতে পারে।

কাজেই বুঝতে পারছ পানি তোমার জন্য কত প্রয়োজনীয়। অসুখ বিসুখের ফলে হঠাৎ করে কোন কারণে তোমার দেহে পানির অভাব হয়ে পড়লে অনেক সময় পানি খেয়ে সে অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না। তখন তাড়াতাড়ি 'স্যালাইন' দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই 'স্যালাইন' প্রধানত বিশুদ্ধ পানি ছাড়া আর কিছুই নয়—সরাসরি এটা তোমার রক্তনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। হাসপাতালে কাউকে দেখতে গিয়ে থাকলে বিছানার উপর ঝোলানো বোতল থেকে রোগীকে ধীরে ধীরে এটা দিতে হয়ত তুমি দেখেছ।

মানুষ, পশু-পাখীর জন্য যে রকম, গাছপালার জন্যও ঠিক একই রকমে পানির প্রয়োজন। তবে প্রাণী যেভাবে পানি পান করতে পারে, গাছ তা পারে না—তাকে মাটি থেকে পানি শুষে নিতে হয়। মাটির পানি গাছে আসে কিভাবে? বুঝতে হলে সহজ একটা পরীক্ষা করে ফেল চটপট। একটা কাঁচা আলু ছিলে নিয়ে

এর মধ্যে একটা গর্ত করে ভেতরে একটু চিনি রাখ। এখন আলুটা পানি ভর্তি একটা প্লেটের উপর রাখলে দেখবে ধীরে ধীরে আলুর ভেতর দিয়ে পানি চুইয়ে গর্তটা পানি ভর্তি হয়ে গেছে। চিনির জন্যে গর্তের

মধ্যে পানির ঘনত্ব প্লেটের পানির চেয়ে বেশি, আর তাই আরো পানি সেখানে গিয়ে জমছে—এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'অসমোসিস'। গাছের শিকড় এমনিভাবে মাটির পানি টেনে নেয় কারণ—পানির ঘনত্ব মাটির চেয়ে শিকড়েই বেশি।

শিকড় থেকে এই পানি পাতায় যায় কি করে? একইভাবে অসমোসিস প্রক্রিয়ায়। গাছের পাতা সূর্যের আলোর সহায়তায় তৈরি হয় যথেষ্ট চিনি। পাতার পানি কিছু শুকিয়ে গিয়ে সেখানে পানির ঘাটতি দেখা দিলে সাথে সাথে সেখানে পানির তুলনায় চিনি বেড়ে যায় বলে চিনির ঘনত্ব সেখানে পাশের অঞ্চলের তুলনায় বেড়ে যায়। ফলে পাতায় সেখান থেকে কিছু পানি টেনে নেয়। একই প্রক্রিয়ায় এবং একই কারণে সে অঞ্চল আবার পানি টেনে নেয় তার পাশের অঞ্চল থেকে এভাবে কাণ্ডের ভেতর দিয়ে শিকড় থেকে পানি উপরে উঠে আসে।

একটু আগে আমরা বললাম গাছের পাতায় তৈরি হয় যথেষ্ট চিনি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের এবং যাবতীয় প্রাণীর খাদ্য আসে এখান থেকেই। শুধু উদ্ভিদই এভাবে খাদ্য তৈরি করতে পারে। এতে কাঁচামাল লাগে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আর পানি। আর প্রয়োজন সূর্যের আলো এবং ক্লোরোফিল নামক সবুজ এক রকম পদার্থ যা গাছের পাতায় রয়েছে। গাছকে যদি পানি না দেয়া হয়, তা হলে এই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-প্রস্তুত প্রণালী চলতে পারে না—ফলে আমরাও আমাদের যাবতীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব। টবের একটা চারায় কিছুদিন পানি না দিয়ে দেখো এটা কেমন নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে যায়। খাবার তৈরি হতে পারে না বলেই এই অবস্থা। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে—কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতায় পানি থাকাতেই ওরা নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে পুষ্ট হয়ে থাকে। পাতলা রাবারের নলের ভেতর পানি ঢুকিয়ে দেখো—কেমন এরা বেশ টানটান সোজা হয়ে থাকে। পানি বের করে দিলেই আবার

নরম হয়ে নেতিয়ে পড়ে। গাছেরও তাই হয়। দেখো উদ্ভিদ জীবনের সাথে পানি কিভাবে জড়িয়ে আছে। এসব অবশ্য অনেকটাই তুমি জান। কারণ তোমাদের বাড়ীর সব্জীর বাগানে পানি দিতে তুমি কোন দিনই

ভুল কর না। তবেই না এটা সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বড় হবে, খাদ্য উৎপাদন করবে, তারপর সে খাদ্য তোমাকেও দেবে শাক-সব্জি হিসেবে।

আগেই বলেছি অসংখ্য রকমের জিনিস পানিতে গলে যেতে পারে। কাজেই যে কোন পানি তুমি নাও না কেন, কিছু না কিছু অন্য জিনিস তাতে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। যে পানি তুমি খাও তাতেও নানা রকম জিনিস মেশানো থাকে। নানা রকম ধাতব লবণ বিভিন্ন জায়গার পানির বিভিন্ন রকম স্বাদ ও গুণাগুণ দিয়ে থাকে। কোমল পানি, কঠিন পানির কথা তুমি হয়ত শুনেছ—যে পানিতে সাবানের ফেনা হয় সেটা কোমল, যেটাতে হয় না সেটা কঠিন। অতিরিক্ত ধাতব লবণের উপস্থিতিই পানিকে কঠিন করে। ধোয়া মোছার জন্য যেমন হোক খাবার জন্য অবশ্য কিছুটা কঠিন পানিই ভাল। এটা খেতেও ভাল, তা ছাড়া কিছু ধাতু শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়ও বটে। এই খাদ্যই উদ্ভিদের কাণ্ডে, শিকড়ে বা ফলে সঞ্চিত হয়।

তবে পানির মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে যা মোটেই শরীরের পক্ষে ভাল নয়। যে কারণে পানি যাবতীয় জীবনের পরিপোষক, সে কারণেই পানির মধ্যে অসংখ্য রকম অতি ক্ষুদ্র জীব অনায়াসে থাকতে ও বাড়তে পারে। নদী নালা পুকুর যেখান থেকেই নাও না কেন, জানবে এর মধ্যে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ গিজ্ গিজ্ করছে। নেহাত খুব ক্ষুদ্র বলেই এদের তুমি দেখতে পাচ্ছ না, অণুবীক্ষণের নিচে দেখতে পেতে। এ সব জীবের অনেকগুলোই তোমার জন্য ক্ষতিকর। অনেকগুলো রীতিমত মারাত্মক, বিশেষ করে যখন মহামারী দেখা দেয়। সৌভাগ্যের কথা হলো ঃ মাটির বেশ ভিতরে যে পানি জমা থাকে, তা পান করার জন্য নিরাপদ। নলকূপ দিয়ে এই পানি তুলে নিয়ে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। শহর কর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা পানি বাদ দিলে এই নলকূপের পানিই তোমার জন্য একমাত্র নিরাপদ পানি। বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে নলকূপ খনন করা হয়েছে। নিজে তো সব অবস্থাতেই এই পানি খাবে, অন্যকেও তাই খেতে বলবে। তবে তার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে যে এই নলকূপের পানি বিষাক্ত আর্সেনিকমুক্ত কিনা। পানি যেমন জীবনের ধারক, এই পানিই দূষিত হয়ে জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

একটি সৌভাগ্যের কথা হলো পানির ভেতরে এইসব ক্ষতিকারক জীবাণু অধিক তাপ সহ্য করতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলে এদের সবগুলো মরে গিয়ে পানি নির্দোষ হয়। কাজেই যখনই সন্দেহ হবে পানিকে ফুটিয়ে এবং পরে ঠাণ্ডা করে পান করবে—সেটা হবে সব চাইতে নিরাপদ ব্যবস্থা। বিশেষ করে বন্যার সময় যখন নলকূপের গোড়া পানিতে ডুবে যায়—তখন অবশ্যই নলকূপের পানিও ফুটিয়ে পান করবে।

ইনজেকশানের ওষুধের সাথে মেশাবার জন্য ছোট ছোট সীল করা কাচের শিশিতে যে পানি ব্যবহার করা হয়—তাকে বলা হয় 'ডিস্টিল্ড ওয়াটার'। এর মানে পাতন করা পানি। আর কিছু নয়, পানিকে একবার ফুটিয়ে বাষ্প করে অন্যত্র নিয়ে আবার তাকে ঠাণ্ডা করে পানিতে পরিণত করা। ভাত রাঁধার সময় ডেগ্‌চির ঢাকনিটা যদি তুলে দেখ, দেখবে তার নিচের দিকে ফোঁটা-ফোঁটা পানি লেগে রয়েছে—পানির বাষ্প ঠাণ্ডা ঢাকনিতে লেগে আবার পানি হয়েছে, এটা পাতন করা পানি। বাষ্প হবার সময় পানির

ভেতরের যাবতীয় বাইরের জিনিস পেছনে পড়ে থাকে বলে এই পানি একেবারেই বিশুদ্ধ। বৃষ্টির পানিও এক রকম পাতন করা পানি। পৃথিবীর সাগরগুলো থেকে সূর্যতাপে প্রচুর পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে—এটাই জমে গিয়ে মেঘ ও পরে বৃষ্টি রূপে নেমে আসছে। প্রতি মিনিটে ২৫ কোটি গ্যালন পানি বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর নেমে আসছে। এই বৃষ্টি যে কতভাগে জীবনের সাথে যুক্ত তা আমরা বাংলাদেশের লোকেরা ভালভাবেই জানি। এই বৃষ্টি এলেই হবে আমাদের ফসল। বৃষ্টির অভাবে প্রয়োজন জমিতে সেচের। বৃষ্টির পানিই আবার নদী-নালা ভর্তি করে সেচের পানি যোগায়। বহু জায়গার উপর দিয়ে আসার সময় এ পানি বয়ে নিয়ে আসে উর্বরা পলি মাটি। সমুদ্রে পড়ার আগে বিছিয়ে দিয়ে যায় এই পলি বাংলাদেশের সমতলে এসব আমাদের বাঁচা-মরার সাথে জড়িত। হবেই না বা কেন, পানির আর এক নামই তো জীবন। নানাভাবে সেইটিই তো আমরা দেখলাম।

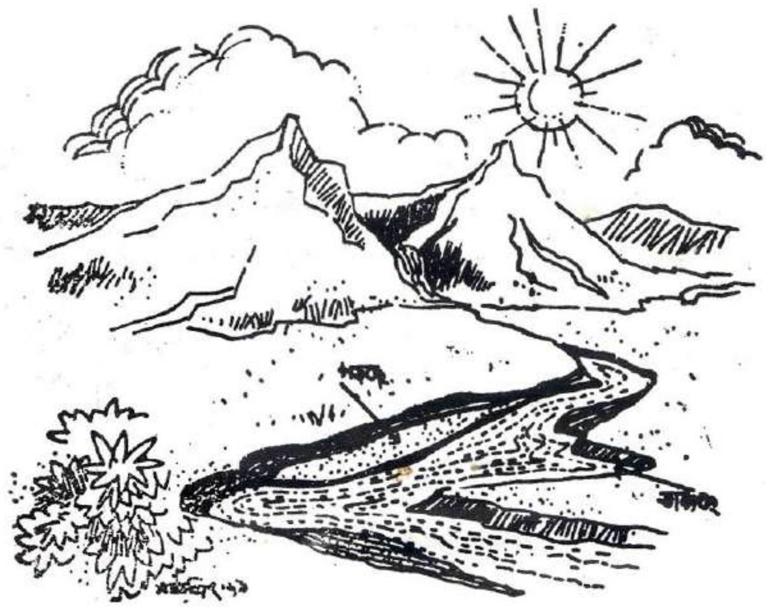

নদী চলে বাঁকে বাঁকে

বরফ গলা পানি আর বৃষ্টির পানির অনেকখানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, কিছুটা মাটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভূগর্ভের পানি হিসেবে সঞ্চিত হয়, আর বাকীটা মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়—যতক্ষণ পর্যন্ত সাগর বা অন্য কোন বড় জলাশয়ে না যায়। এই শেষেরটাই নদী। স্বাভাবিকভাবেই গড়ানোর কাজটা ভাল হতে পারে পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানে ঢালের উপর গড়িয়ে আসা ছোট ছোট জলধারা মিলিত হয়ে সহজেই নদীর রূপ লাভ করতে পারে।

পাহাড়ী ঢালে নদীর গতি যেখানে খুব বেশী, সেখানে এটা সামনের দিকে যেতে যেতে এর তলাটাও যথেষ্ট খুঁড়ে ফেলতে পারে। তলায় অনেক খনিজ পদার্থ পানিতে গলে যেতে পারে। আসলে কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারে তার ভূমিকা অল্প। পানির প্রচণ্ড শক্তিতে বড় বড় পাথর লাফাতে লাফাতে, গড়াগড়ি খেতে খেতে স্রোতের সাথে চলে। এরাই হাতুড়ির মত কাজ করে নদীর তলাকে ক্ষয়ে ফেলে। এভাবে পরস্পরের সাথে ধাক্কাধাক্কিতে পাথরগুলোও ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত গুঁড়িয়ে গিয়ে মিহি মাটির আকারে নদীর পানিতে মিশে যায়, এরাই নদীর পলি। তা ছাড়া পানির সাথে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থগুলোও থাকে। এভাবে একটা নদী বিপুল পরিমাণ মাটি ও খনিজ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একটা কাল্পনিক নদীর জীবন ইতিহাস ভেবে দেখা যাক। পাহাড়ী এলাকায় তার জন্ম। দুরন্ত তরুণ নদী বেশ তাড়াতাড়ি তার তলা ক্ষয় করে গভীর খরস্রোতা নদী হিসেবে চলে। বৃষ্টির পানি, ধ্বস প্রভৃতির কারণে দুই পাড়ও কিছু কিছু ক্ষয় হয়েছে বলে এর খাদটা হলো অনেকটা ইংরেজী 'V' অক্ষরের মতো। এ পর্যন্ত সে তলা ক্ষয় করতেই ব্যস্ত, দু'পাশের দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। ইতিমধ্যে তলা ক্ষয় করতে করতে তলায় নদীর ঢাল কমে এসেছে। শেষ পর্যন্ত সাগর সমতলের কাছাকাছি একটা তলে যখন তার তলা এসে ঠেকছে তখন নিচের ক্ষয়ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এখন থেকে দু'পাশের ক্ষয় ক্রিয়াটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। এদ্দিন পর্যন্ত নদী অপেক্ষাকৃত সোজা পথে চলেছে, এবার তার এঁকেবেঁকে চলার পালা। কোন একটা বাধা সামনে আসলে নদী সেখানে বাঁক নেয়। বাঁকের বাইরের দিকটাতেই তার

আঘাত সবচেয়ে বেশি। কাজেই সেখানে পাড় ভাঙ্গে, ক্ষয় হয়। বাঁকের ভেতরের দিকটায় আঘাত কম, কাজেই বয়ে আনা কিছুটা মাটি ওখানে জমা হলো। এভাবে বাঁকের পরিসর বড় হলো। এতদিন যা ছিল

সরু, গভীর জলধারা এখন তা দু'পাশে ক্রমবর্ধমান জায়গা জুড়ে 'নদীর উপত্যকার' সৃষ্টি করলো, নদীর বানের পানির সেখানে অবাধ বিচরণ। নদীর এপার ভেঙ্গে ওপার গড়ার মধ্য দিয়ে জায়গাটাও বেশ সমতল হয়ে এল। আবার উপনদী, শাখা নদীগুলো মিলে বেশ বড় একটা ভূখণ্ডকে নদী এভাবে সমতল করে নিতে পারে। এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি নদী বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। এবার এর উপত্যকা যতই প্রশস্ত হবে আর যত বড় সমতল সৃষ্টি হবে, ততই নদী বুড়ো হতে থাকবে।

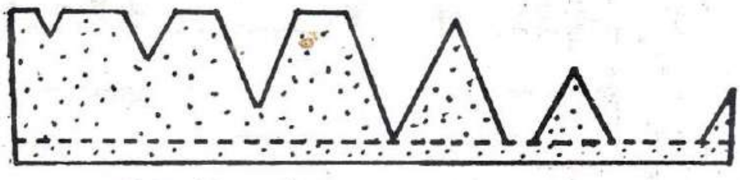

নদীকে যদি আড়াআড়ি কাটা হয় তাহলে এরকম দেখা যাবে।

নদীকে উপর থেকে দেখলে এরকম দেখা যাবে।

নদীর শৈশবে ক্ষয়টাই প্রধান কাজ, সঞ্চয় নয়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে বাহিত পলি সুযোগ মত নদীর তলে সঞ্চয় করাটাও ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে থাকে। সেখানেই নদীর গতি একটু কম হবে, সেখানেই পলি পড়ে চরার মত বাধা সৃষ্টি হতে পারে। একটা বোতলে পানির মধ্যে বালি, মাটি প্রভৃতি মিশিয়ে যতক্ষণ পানি নাড়তে থাকবে ততক্ষণে তলায় কিছু পড়বে না, কিন্তু যেই পানি শান্ত হবে অমনি তলায় তলানি পড়বে। এভাবেই পলি পড়ে। বাঁকের ভেতরের দিকটাতেও এমনি করে চড়া পড়ে। বন্যার সময় নদীর পানি দু'পাশে অনেকখানি জায়গাতে গড়ায়। হঠাৎ করে নদীর পরিসর বেড়ে যাওয়াতে এ সময় এর গতিবেগও কমে যায়, ফলে সর্বত্র পলি পড়ে, অনেক জায়গা জুড়ে। অপেক্ষাকৃত মোটা, বেলে পলিগুলো পড়ে নদীর খাতের কাছাকাছি, আর মিহি পলিগুলো পড়ে খাত থেকে দূরে। এই মিহি এঁটেল খনিজ মেশানো ও জৈব পলির জন্য নদী-উপত্যকার এই অঞ্চল খুবই উর্বরা হয়। এখন বুঝতে পারছ নদী-বিধৌত অঞ্চল মাত্রই কেন কৃষির জন্য এত উপযোগী হয়, সে আমাদের দেশে যেমনি, পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় নদী-উপত্যকার জন্যও তেমনি।

পলি সঞ্চয়ের সর্বশেষ রূপ হচ্ছে মোহনার কাছে বদ্বীপের সৃষ্টি। নদী যখন সাগরে পড়ার পর সেখানে তার গতি হারায়, তখন বাদবাকী পলি মোহনার কাছে সাগর বুকে সঞ্চিত হয়। এর একটা বাড়তি কারণ হলো সাগরের নোনতা পানিতে কাদার কণাগুলো জড়াজড়ি করে থাকতে চায়, ফলে ভারী হয়ে তাড়াতাড়ি

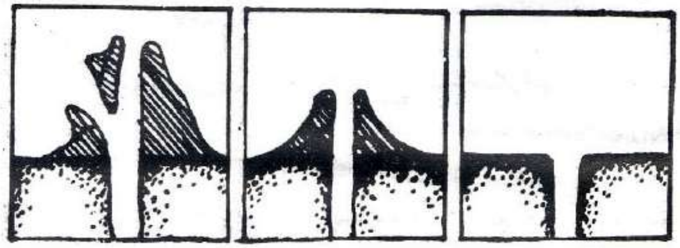

সঞ্চিত হয়। মোহনার দু'পাশে ত্রিভুজাকারে পলি সঞ্চিত হতে থাকে, ধীরে ধীরে চরা জেগে উঠে। এই চরার উপর দিয়ে ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়াতে কোন এক বন্যার সময় এর উপর দিয়ে নদীর নতুন খাত সৃষ্টি হয়। ফলে 'ব' এর আকারের একটা চরা আলাদা হয়ে সৃষ্টি হয় বদ্বীপ। এভাবে বদ্বীপ ও বহু নদী খাতের সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণ উপকূলের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে সেটা কি রকম। পলি দিয়ে গঠিত এইসব বদ্বীপ যে খুবই উর্বর হয় তা বেশ বুঝতে পারছ। আর একটা জিনিস ইতিমধ্যে বুঝতে পারছ যে, নদী একটা জায়গার উপর দিয়ে শুধু বয়েই যায় না, এই নদী সেই জায়গাটিকে গড়ে, পিটে, ক্ষয়ে বর্তমান অবস্থায় এনেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভাঙ্গাগড়ায় নদীর অবদান অনেকখানি।

উপরে নদী সম্বন্ধে যত কথা বলা হলো পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পারের ছেলেমেয়ে হিসেবে তোমরা এসবের সাথে অপরিচিত নও। নদীর ভাঙ্গা, গতি পরিবর্তন, বন্যা মানুষের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ বয়ে আনে সে তোমরা দেখেছ। আবার এই নদীই কিভাবে আমাদের বাংলাদেশকে সুজলা-সুফলা করেছে তাও তোমরা দেখছ। আমাদের দেশটাই তো নদীর পলিতে সৃষ্ট, সুখে-দুঃখে নদী নিয়েই তো এই দেশ। নদীর আনা দুঃখ ঘুচাতে হলে, নদীকে আরো উপকারে লাগাতে হলে তাকে বুঝতে হবে ভাল করে, একে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। প্রয়োজনে সবাই মিলে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে একে বদলাতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অনেকখানি জড়িয়ে আছে এর সাথে।

রংধনু

বৃষ্টির পরে পরে সূর্যের বিপরীত দিকের আকাশে বহু বর্ণা বিরাট একটি ধনুক ফুটে উঠতে দেখা যায়—সেটিই রংধনু। সে সময় তোমার সামনে যেদিকে রংধনু দেখেছো, সেখানে কোথাও বৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। দুপুরে সূর্য মাথার উপরে বা তার কাছাকাছি তখন রংধনু দেখা যায় না—বরং সকালে বা বিকেলেই এর দেখা যাবার সম্ভাবনা বেশি।

বৃষ্টির পানির ফোঁটার মধ্যে সূর্যের আলো বেঁকে গিয়েই রংধনুর সৃষ্টি হয়। আলো যখনই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখনই একটু বেঁকে যায়—যাকে বলে আলোর প্রতিসরণ। তবে কতখানি বাঁকবে তা নির্ভর করে আলোর রঙের উপর। সূর্যের আলো দেখতে সাদা হলেও আসলে এটা সাতটি আলাদা আলাদা রঙের মিশ্রণ—লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানী, নীল আর বেগুনী। বাতাস থেকে পানিতে যাবার সময় বেগুনী রং বাঁকে সবচেয়ে বেশি আর লাল রং বাঁকে সবচেয়ে কম। গোলাকৃতি বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অনেকটা কাচের লেন্সের কাজ করে। বিভিন্ন রং বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে গিয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। এরা যখন ফোঁটার অন্য পাশে গিয়ে পড়ে তখন আলোর কিছুটা সামনের দিকে চলে যায় বটে কিন্তু অংশ বিশেষ ফিরে আসে। এটা যখন পানি থেকে বাতাসে বেরুবে, তখন কিন্তু লাল আলো বাঁকবে সব চেয়ে বেশি আর বেগুনী আলো সব চেয়ে কম। কাজেই শেষ পর্যন্ত যখন আলোগুলো মাটির উপর দর্শকের চোখে পৌঁছাচ্ছে, তখন লাল আলোকে মনে হবে সব সময় উপরে থাকছে আর বেগুনী আলো সব সময় নিচে—বাকী রংগুলো পর্যায়ক্রমে মাঝখানে থাকে। এভাবে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে দু'বার প্রতিসরিত এবং একবার প্রতিফলিত হয়ে যে বর্ণালীর সৃষ্টি হয়, সেটাকে বলা হয় প্রাথমিক রংধনু। একজন দর্শকের কাছে কোন ফোঁটা থেকে হয়ত লাল আলোটা এসে পৌঁছাচ্ছে। আরেকটা ফোঁটা থেকে আসছে কমলা আলো, আরেকটা থেকে নীল ইত্যাদি। এমনি করে তার কাছে পুরো রংধনু ফুটে উঠছে।

অনেক সময় উজ্জ্বল প্রাথমিক রংধনু ছাড়াও এর কিছু দূর উপরে আর একটা অস্পষ্ট রংধনু দেখা যায়। এই দ্বিতীয়টিতে লাল রং থাকে সবার নিচে আর বেগুনী থাকে সবার উপরে—প্রাথমিকটার ঠিক উল্টো। এই দ্বিতীয় রংধনুটার সৃষ্টি হয়েছে সেই সব আলো দিয়ে যেগুলো একই ফোঁটা থেকে দু'বার প্রতিফলিত হয়েছে। খুব বেশী অস্পষ্ট হয়ে পড়লে প্রায়ই এই দ্বিতীয় রংধনুটি দেখা যায় না।

সূর্য যদি আকাশে হেলে থাকে (সকালে-বিকেলে যা হয়) তবে প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়ে এর আলো এমন কোণ করে আসে যে তা পৃথিবীতে চলে আসে এবং পৃথিবীর দর্শক তার বিশ্লিষ্ট রংগুলো রংধনুর আকারে দেখতে পারে। কিন্তু সূর্য যদি উপরে থাকে তাহলে সেই কোণ এমন হয় যে আলো আর পৃথিবীতে আসেই না। তখন রংধনু দেখা সম্ভব নয়।

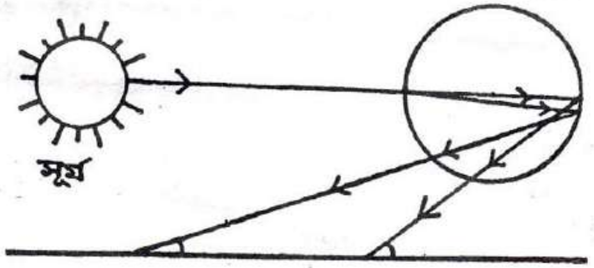

রংধনুর জন্য বৃষ্টির ফোটার দরকার। বৃষ্টির বদলে পানির যে কোন ফোয়ারা থেকেও একই ক্রিয়া হতে পারে। যেমন জলপ্রপাত, কৃত্রিম ফোয়ারা, বাগানের হোস পাইপ থেকে ছিটানো পানি ইত্যাদি। সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মুখে পানি নিয়ে উপরের দিকে কুলি করে ছিটিয়ে তুমি নিজেও সহজে চমৎকার রংধনুর সৃষ্টি করতে পার। রংধনু ভারী সুন্দর জিনিস, যথেষ্ট মজা দেয় আবার সাথে সাতে আলোর কয়েকটা খুব মৌলিক ধর্মের সাথে পরিচিত হয়ে গেলে তুমি এর মাধ্যমে।

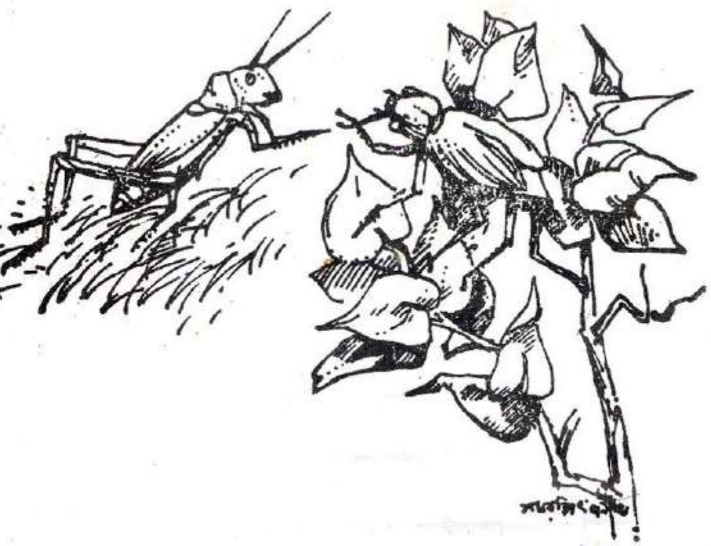

পতঙ্গ সঙ্গীত

শহর থেকে যখন গ্রামে যাও, তখন শহরের যাবতীয় কোলাহল হারিয়ে যায়। গ্রামের শান্ত সন্ধ্যায় কোন্ শব্দটি তোমার কানে বিশেষ করে বাজে? হয়ত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। গ্রামীণ শব্দের মধ্যে এটা বিশিষ্ট বলেই তো বলা হয়—ঝিঁ ঝিঁ ডাকা পল্লী। পোকার গান শোনার জন্য অবশ্য সব সময় গ্রামে যেতে হয় না। রাত্রি বেলা তোমার মশারীর ভেতর একটি মাত্র মশা কোনক্রমে ঢুকে পড়ে বার বার তোমার কানের কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকে, তখন যতই অপ্রিয় হোক না কেন সেও গান গেয়ে যায়। তা ছাড়া মাছির গান, ভোমরার গুরুগম্ভীর গান আর ঘাস-ফড়িং-এর গান নিত্য তুমি শুনতে পাবে যদি শোনার চেষ্টা করো।

আমরা যে অর্থে গলা সেধে গান গাই, পতঙ্গ জগতের বেশীর ভাগ গান কিন্তু সেভাবে গাওয়া হয় না। এরা কেউ গায় পা দিয়ে, কেউ পাখা দিয়ে, কেউ কেউ শরীরের অন্যান্য নানা অংশ দিয়ে। এদের কেউ কেউ গান গাওয়ার জন্যই গায়, অর্থাৎ ইচ্ছে করেই শব্দ সৃষ্টি করে। অন্যেরা কিন্তু আরেকটা কাজ করতে গিয়ে শব্দ সৃষ্টি করে। যেমন বেচারা মশাটির কোন ইচ্ছে নেই যে গান গেয়ে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে বা তোমাকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু উড়তে গিয়ে তার পাখার যে শব্দ হয়, সেটাই তার গান হয়ে দাঁড়ায়।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার কথাই ধরা যাক! এর গান গাওয়া অনেকটা বেহালা বাজানোর মতো। বেহালার তারে ছড় ঘষে ঘষে যে রকম শব্দ তৈরি হয়—তেমনি ঝিঁ ঝিঁ পোকার সামনের দুই পাখার গোড়া পরস্পরেরগায়ে ঘষে ঝিঁঝিঁর ডাক সৃষ্টি হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এভাবে ডাকতে পারে শুধু পুরুষ ঝিঁঝিঁ

পোকা, স্ত্রীগুলো পারে না। অনেকগুলো ঝিঁঝিঁ পোকা যখন এক সঙ্গে এভাবে পাখা ঘষা আরম্ভ কর তখন রীতিমত একটা অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে যায়।

ছোট শুঁড় যুক্ত ঘাসফড়িংগুলোও ঝিঁঝির মতো এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে। এরা সাধারণত পেছনের পা পাখার সাথে ঘষে শব্দ সৃষ্টি করে। পায়ে সারিবদ্ধ যে সব শক্ত লোমের মত থাকে, এরা পাখার শিরার উপর এক এক করে যখন পার হয়ে যায়; তখন কম্পনের সৃষ্টি হয়, আর তার থেকেই শব্দ। একটা চিরুনি নিয়ে তার দাঁতগুলোর উপর দিয়ে একটা কার্ডবোর্ড ঘষে নিয়ে গেল যেভাবে শব্দ হবে এখানেও সে রকম ব্যাপারই ঘটছে। একা একটা লোম পার হবার সময় যে কম্পন হয়—তাই আবার শরীরের বিভিন্ন জিনিসকে কাঁপায়, এক একটাকে এক এক হারে। ফলে বিভিন্ন খাদের শব্দ মিশে বেশ জটিল সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। আজকাল উন্নত রেকডিং পদ্ধতিতে এইসব শব্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।

একটা টিনের ঢাকনাকে বার বার টোল খাওয়ালে যেরকম শব্দ তৈরি হয়, কোন কোন ফড়িং আছে সেভাবে পেটের কাছের বিশেষ ঝিল্লীকে কাঁপিয়ে শব্দ সৃষ্টি করে। সেকেণ্ডে এরা এক শ' বারের মত এই ঝিল্লীর ওঠা-নামা করতে পারে। ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেটা অনেকটা স্টেশন ঠিক মতো ধরা না হলে রেডিও থেকে বের হওয়া ফর্‌র্‌ শব্দের মতো হয়।

অনেক পতঙ্গ শব্দ করে উড়বার সময়। এদের শব্দ তৈরি হয় পাখার দ্রুত আন্দোলনের ফলে। যত দ্রুত পাখা নড়বে, ততো চিকন আওয়াজ বের হবে। তাই ভোমরার গান এতো মৃদুমন্দ, মশার গান অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ। অবশ্য এই গানের সব গুণাগুণ শুধু পাখা চালাবার দ্রুততার উপর নির্ভর করে না; উড়বার নানা ভঙ্গিমায় কিছু কিছু নির্ভর করে। আজকাল খুব দ্রুত ফটোগ্রাফ তোলা যায় বলে পতঙ্গের উড়বার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের ফটো তুলে রাখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন এই সব ফটো নিয়ে গবেষণা করে পতঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে জানবার চেষ্টা করছেন।

পিঁপড়ার কলোনী

নিজেদের মধ্যে নানা কাজ ভাগ করে নিয়ে দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে এরকম মাত্র কয়েক ধরনের পতঙ্গ আছে। মৌমাছি, বোলতা, উই, পিঁপড়া এরা এভাবে কলোনী বানিয়ে বাস করতে অভ্যস্ত। পিঁপড়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের কলোনী এবং সমাজবদ্ধ বসবাস সবচেয়ে বেশী স্থায়ী ও উন্নত।

পিঁপড়ার বাসা আবিষ্কারের জন্য তোমাকে হয়ত খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। তোমার আশেপাশে, বাগানের মাটিতে, এমনকি পুরানো পাকা দেয়ালের মধ্যেও গর্ত ও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এরা চমৎকার কলোনী তৈরি করে নেয়। মাটির ভেতর যারা বাসা তৈরি করে তারা জটিল সব সুড়ঙ্গ ও কামরা তৈরি করে খননের মাধ্যমে। খনন করা গুঁড়ো মাটি দিয়ে হয়ত বাসার উপরেই একটা ঢিবি তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এরকম ঢিবি করা হয় না। কাঠ-পিঁপড়া জাতীয় পিঁপড়ারা খনন করে তোলা মাটি দিয়ে বেশ একটা টিলার মত করে এবং এর মধ্যেও প্রচুর কামরা ও সুড়ঙ্গ তৈরি করে। পাথরের তলায় গাছের গুঁড়ির ভেতর এমন কি গাছের পাতা একত্র করে এবং বেঁধে নিয়ে এক রকম কলোনী তৈরি হয়। পিঁপড়ার জাত ভেদ নিয়ে এরকম এক একটা কলোনীতে কয়েক ডজন থেকে শুরু করে বহু হাজার পিঁপড়ারও বাস হতে পারে।

জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা অনুসারে মানুষের যে রকম ভাগ রয়েছে পিঁপড়ারও সে রকম আছে। কোন জাতের পিঁপড়া শিকারী শ্রেণীর, কোনটা পশুপালক শ্রেণীর, আবার কোনটা কৃষিজীবী! 'এফিড' নামে এক ধরনের ক্ষুদ্র পোকা আছে যাদেরকে পিঁপড়ার গাই বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। পিঁপড়ারা এদের চরিয়ে বেড়ায়, বাসায় রাখে এবং এদের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে মধুর মতো এক ধরনের রস বের করে খায়—এ যেন তাদের গাইয়ের দুধ। এদের পশুপালক পিঁপড়া বলা যেতে পারে। কোন কোন জাতের পিঁপড়া উদ্ভিজ্জ খাবার সংগ্রহ করে এবং বাসায় এনে জমা করতে থাকে। এমন অদ্ভুত পিঁপড়াও আছে,

যারা রীতিমত চাষবাস করে। তারা তাদের কলোনীর ভেতরেই এক জাতীয় ফাঙ্গাসের চাষ করে, যা তারা খায়। কলোনীর কয়েকটা কামরা এর জন্য আলাদা করা থাকে এবং তাতে টুকরো ঘাসপাতা ও মলের সার রেখে চাষের উপযুক্ত করা হয়। ক'দিন পর বেশ উঁচু উঁচু ঢিবির মতো ফাঙ্গাস এখানে গড়ে উঠে। মজার ব্যাপার হলো পরে কোন রাণী পিঁপড়া নতুন কলোনী তৈরি করতে চাইলে এই ফাঙ্গাস সামান্য একটু মুখে করে সেখানে নিয়ে যায়। এ যেন তার বীজ–এর থেকে আবার নতুন চাষবাস হবে।

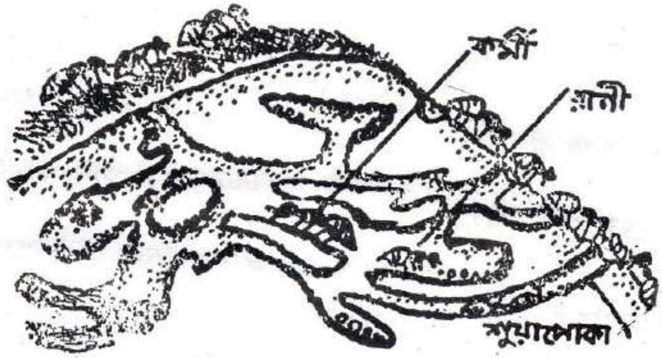

পুরুষ ও স্ত্রী পিঁপড়ার এক পর্যায়ে পাখা থাকে। কিন্তু ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী পিঁপড়ার পাখা খসে পড়ে। প্রথম যে সব শুঁয়ো পোকা ডিম থেকে বের হয় তারা মায়ের লালা খেয়ে বড় হয়। এরা হয় কর্মী পিঁপড়া। বড় হয়েই এরা কলোনীর কাজ সম্পূর্ণ করতে লেগে যায় অক্লান্ত পরিশ্রমে। পরবর্তী সময়ে মা পিঁপড়া অর্থাৎ রাণী আরো অনেক ডিম পাড়ে। এ সময় কর্মীরা তাকে খাওয়ায়, রক্ষণাবেক্ষণ করে। কর্মী পিঁপড়ারা সব সময় সবাই এক রকমের হয় না। এদের মধ্যে কারো কারো বেশ বড়ো মাথা আর শক্ত চোয়ালা থাকে। এরা হলো সৈনিক পিঁপড়া; এদের কাজ কলোনী পাহারা দেয়া। অন্যদের কেউ কেউ খাদ্য সংগ্রহ করে, আবার কেউ কেউ বাচ্চাদের দেখাশুনা করে। এই দেখাশুনার কাজ কিন্তু বেশ যত্ন সহকারেই করা হয়। পিঁপড়ার ডিম, শুঁয়া পোকা, মূককীট সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা কামরা রয়েছে। শুঁয়া পোকাদের শুধু খাইয়েই দেয়া হয় না, ধাত্রী কর্মীরা এদের গোসল করিয়ে পরিষ্কার রাখে।

আন্ডা-বাচ্চাসহ পিঁপড়ার দল যখন নতুন কলোনীতে চলে যায়, সে দৃশ্য দেখার মতো। কর্মীরা রাণীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলে, আর তাদের মুখে মুখে থাকে ডিম ও নানা রসদপাতি। এ দৃশ্য তুমিও নিশ্চয়ই দেখেছো।

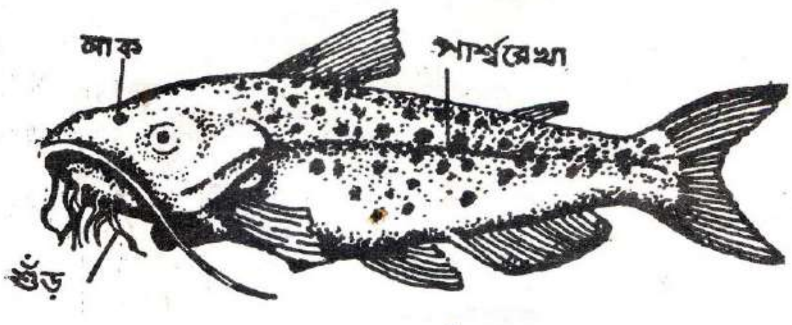

মাছের অনুভূতি

অনুভব করার জন্য যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় মানুষের আছে তাদের তোমরা ভাল করেই জান। চামড়া দিয়ে আমাদের স্পর্শের অনুভূতি হয়, চোখ দিয়ে দেখার, কান দিয়ে শোনার, জিহ্বা দিয়ে স্বাদের আর নাক দিয়ে গন্ধ নেয়ার। মাছেরও এ রকম বিভিন্ন অনুভূতি রয়েছে—তবে তাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব মানুষের মতো নয়। তফাতগুলো বেশ খেয়াল করার মতো। বিশেষ করে তার চার পাশের পানির মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটছে সে দিকে লক্ষ্য রাখার উপযোগী করেই এ সব ইন্দ্রিয় তৈরি।

কাঁটাওয়ালা মাছের স্পর্শ শক্তি বেশ প্রখর। মুখের কাছে বেশ কয়েকটা সূতার মতো শুঁড় থাকতে দেখা যায় কোন কোন মাছের—সেগুলো সামান্যতম স্পর্শই ধরে ফেলতে পারে। শিং-মাগুরের এরকম শুঁড় তুমি দেখেছ। আমাদের নাকের মতোই মাছের নাক রয়েছে গন্ধ নেবার। মুখের সামনে বা মাথার উপর ছোট দু'টা ছিদ্রের আকারে এরা থাকে। তবে আমাদের মতো মুখের সাথে সংযুক্ত নয়। শিকার করতে বা পানির মধ্যে নানা দ্রব্যাদির অবস্থিতি জানতে মাছ অনেক সময় দেখার চেয়ে শোঁকার উপরই বেশি নির্ভর করে। তাই মস্তিষ্কের যে অংশ এই শোঁকার অনুভূতি জাগায় মাচের ক্ষেত্রে তা খুবই উন্নত। আমরা স্বাদ নিতে পারি শুধু জিহ্বায় এবং কিছুটা মুখের ভেতরের দেয়ালে। মাছ কিন্তু শরীরের বাইরের দিকটাতেও স্বাদ নিতে পারে। যেমন কোন কোন মাছ লেজ দিয়েও স্বাদ নিতে পারে!

মাছের চোখ আমাদের এবং অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর চোখের মতোই। রঙ সম্বন্ধে মাছের অনুভূতি বেশ স্পষ্ট বলেই মনে হয় বিশেষ করে মাছের সামাজিক জীবনে রঙের বেশ ভূমিকা রয়েছে। মাছের কান অপেক্ষাকৃত সরল হলেও তা শব্দ গ্রহণে বেশ সক্ষম। পানির মধ্য দিয়ে বাহিত শব্দ কানের অভ্যন্তরীণ কয়েকটা অংশের মাধ্যমে শ্রবণের স্নায়ুর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। মাছের কানের কোন বাইরের অংশ নেই। কানের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট এক রকম পাথর থাকে যার দ্বারা মাছের উপর নিচ জ্ঞান হয়—অর্থাৎ সে উপুড় হয়ে আছে, কি চিৎ হয়ে আছে তা মাছ বুঝতে পারে। সব মাছের শ্রবণ-শক্তি এক রকম নয়। কোন কোন মাছ প্রায় বধির বললেই চলে। অথচ রুই-কাতলা জাতীয় মাছ কিংবা শিং-মাগুর মাছের শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত প্রখর। এর চমৎকার কারণও আছে। এই শেষোক্ত মাছগুলোর ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের সাথে

সংযুক্ত কয়েকটা হাড়ের সাহায্যে কান এবং বায়ু ভর্তি ব্লাডার সংযুক্ত থাকে। মাছ যে সব শব্দ কম্পন শোনে তা বায়ু ভর্তি ব্লাডারে পরিবর্ধিত হয়ে তবেই কানে গিয়ে পৌঁছায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পানির ভেতরে ডুবো জাহাজের অবস্থিতি জানার জন্য এর শব্দ মাইক্রোফোনে ধরে নিয়ে মাইক্রোফোনটা রাখা হতো ডুবানো কোন ফাঁপা পাত্রের উপর। এতে শব্দ পরিবর্তিত হয়ে শোনাটা সহজ হতো। এখানেও একই প্রক্রিয়া।

মাছের অনুভূতির জন্য এমন একটা জিনিস রয়েছে, যা আর কোন কিছুর নেই। শরীরের পাশ বরাবরে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত একটা লম্বা রেখা দেখা যায়, যাকে বলা হয় পার্শ্ব রেখা। মাথার উপর এই রেখা বেশ কয়েকটা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এটা অনুভূতির একটি বাড়তি উপায়। এ রেখার উপর রয়েছে বিশেষ কিছু জীব-কোষ যেখানে সংবেদী স্নায়ুতন্ত্রগুলো এসে শেষ হয়েছে। চামড়ার নিচের খোলা গর্তের ভেতরে বা আঁশের ভেতর দিয়ে বাইরের সাথে সংযুক্ত নলের ভেতরে এইসব কোষ রক্ষিত থাকে। এসব কোষের প্রত্যেকটিতে থাকে কতকগুলো ছোট ছোট কেশর, যা ঐ গর্ত বা নলের ভেতরের পানিতে বের হয়ে থাকে। পানির মধ্যে সামান্যতম অস্থিরতা এ কেশরের মারফত সংবেদী কোষে সাড়া জাগাতে পারে। খাবারের সন্ধানে বা আত্মরক্ষার কাজে এই পার্শ্ব রেখা মাছকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

মাকড়সার জাল

দেয়ালের কোণায়, টেবিলের পেছনে হরদম যে সব মাকড়সার জাল জমে উঠে, তা তোমার আমারই যতই বিরক্তির কারণ হোক না কেন, জানার আর লক্ষ্য করার অনেক জিনিস আছে তাতে। মাকড়সার জালকে যদিও ঝুল বা ময়লা জঞ্জাল হিসেবে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত, আসলে এটা কিন্তু এক ধরনের সিল্ক সূতার তৈরি। রেশমের গুটি পোকার তৈরি যে সিল্ক সূতা দিয়ে আমরা মূল্যবান জামা কাপড় তৈরি করি, তার চেয়ে কম ভাল নয়। কিন্তু মাকড়সার জাল থেকে লাভজনকভাবে সূতা সংগ্রহের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নি বলেই এটা মূল্যবান বস্তু হিসেবে না দেখে আমরা উপদ্রব হিসেবে দেখি।

মাকড়সার পেটে বিশিষ্ট গ্রন্থির দ্বারা এই সূতা তৈরি হয়, আর তা শরীরের একদম পেছন ভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সূতা বের করতে করতে এখানে থেকে ওখানে গিয়ে মাকড়সা যে সুন্দর জাল রচনা করে, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই জাল মাকড়সার আবাস স্থল, আবার শিকার ধরারও ফাঁদ।

মাকড়সা ডিম পাড়ে সিল্কের তৈরি নরম গুটির ভেতরে। এ রকম ডিম ভর্তি বড় বড় সাদা বা হলদে গুটি পেছনে আটকানো অবস্থায় মা-মাকড়সাকে চলাফেরা করতে তোমরা হয়ত দেখেছো। ডিম ফুটে

বাচ্চা মাকড়সাকে এক সময় নিজের চেষ্টায় খাদ্যের খোঁজে বেরুতে হয়। এদের কোন কোনটা লম্বা সিল্ক সূতায় ঝুলন্ত অবস্থায় বেশ দূরে দূরে চলে যেতে পারে। তারপর হয়তো এরা জাল বুনে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে।

জাল বোনার কায়দাটা ভারী চমৎকার। প্রথমে একটা সূতা এমনিতেই ঝুলিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোন কিছুতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। এরপর জালের কাঠামোটা তৈরি করে ফেলা হয়। আকৃতি কি হবে তা নির্ভর করবে কোণাটা কি রকম; কয় দিকে ধরা পাওয়া গেল তার উপর। একটা কেন্দ্রবিন্দু থেকে চারিদিকে কিছু সোজা সূতা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর পেঁচানো সূতার পালা। প্রথমে মাঝখান থেকে বাইরের দিকে একটা সূতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনা হবে, তারপর আর একবার বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পেঁচিয়ে আসবে। দ্বিতীয় বারের সূতাগুলো হবে আঠালো, আর এরাই ব্যবহৃত হয় পোকামাকড়কে জালে আটকাতে।

জাল সম্পূর্ণ হলে মাকড়সা চুপটি করে মাঝখানটায় বসে থাকে। অনেক সময় জালের এক প্রান্তে কিছুর মধ্যে লুকিয়েও থাকে এটা। কিন্তু সব রকম অবস্থাতেই এটা জালের সংস্পর্শে থাকে এবং আটকে পড়া পোকা-মাকড়ের নড়াচড়ার ফলে জালের নড়াচড়া টের পায়। সাথে সাথেই সে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সদ্য তৈরি সিল্ক দিয়ে নিপুণতার সাথে তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। বাঁধার সময় প্রয়োজন হলে দু'একটা কামড় দিয়ে শিকারকে কাবু করে নেয়। এই হুটোপুটির সময় মাকড়সা নিজে যে তার নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে না, তারও সুন্দর কারণ আছে। মাকড়সার পায়ে সব সময় তৈলাক্ত পদার্থের একটা আবরণ থাকে যার ফলে জাল এর সাথে লাগে না। ক্ষুধা না থাকলে এভাবে বাঁধা অবস্থায় শিকারকে অনেকক্ষণ ফেলে রাখে এটা। তারপর সময়মত ধীরে-সুস্থে একে মেরে খায়। এভাবে ছোট মাকড়সাও বেশ বড় বড় পোকা ধরে খেতে পারে স্বল্প আয়াসে।

পোকা ধরতে গিয়ে বা অন্য কারণে মাকড়সার জাল এদিক-ওদিক ছিঁড়ে গেলে, তা বড় একটা মেরামত করা হয় না। বরং প্রয়োজন হলেই নতুন জাল বানিয়ে ফেলা হয়। প্রায় রোজ রোজই নতুন জাল বানানো হয় এভাবে। তাই তো একবার ঝুল পরিষ্কার করার পর খুব তাড়াতাড়ি আবার যথেষ্ট ঝুল জমে উঠে ঘরের আনাচে-কানাচে।

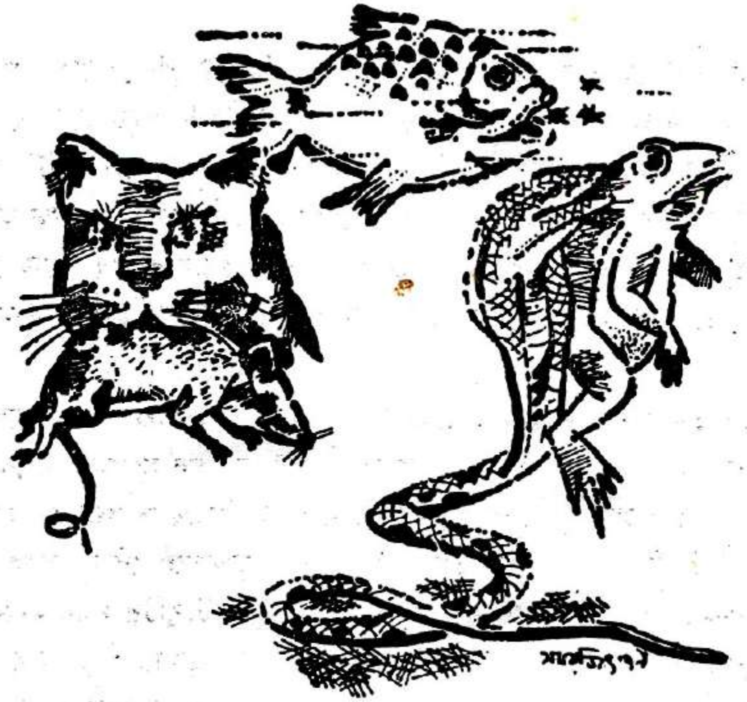

খাদ্যের চেইন

খাবার ছাড়া কেউ বাঁচে না। কিন্তু খাদ্য খেয়ে কষ্ট করে এ রকম অনেকেই বেঁচে থাকে শুধু অন্যের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য। দুঃখজনক হলেও ব্যাপারটা তাই। বড় পোকা, ছোট পোকা ধরে খাচ্ছে, ব্যাঙ বড় পোকা খাচ্ছে, সাপ ব্যাঙ খাচ্ছে, বেজীতে সাপ খাচ্ছে—আর এভাবে চলছে খাদ্যের চেইন। অবশ্য এর মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটা তফাত আছে। তফাতটা হলো উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, প্রাণী তা পারে না। পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড আর মাটির মধ্যেকার খনিজ পদার্থগুলো মিশিয়ে সূর্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদ জটিল সব জৈবপদার্থ নিজের জন্য তৈরি করে নেয়। প্রাণীকে কিন্তু এসব যোগাড় করতে হয় উদ্ভিদ থেকে বা অন্য প্রাণীর থেকে, যে এটা উদ্ভিদ থেকে পেয়েছে।

খাদ্যের সব চেইন উদ্ভিদ দিয়ে শুরু হয়, আর এক পর্যায়ে এতে প্রাণীরা জুটে যায়। এর একটা নিয়ম হলো নিচের দিকে খাবারের ভাগ নেয় অনেকে, কিন্তু উপরের দিকে ভাগীদারের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসে। একটা ঘাসবনে পোকা-ধরা পোকার সংখ্যা অনেক। যে কয়টা ব্যাঙ এসব পোকার উপর নির্ভর করছে, তাদের সংখ্যা কিন্তু সীমিত। সাপের সংখ্যা আরো কম। তারপর কয়টা বেজী বা কয়টা চিল ঐ সাপের উপর নির্ভর করছে তা তো হাতে গুণা যায়। হয়তো বা একটা বেজীই একটা বিশেষ অঞ্চলকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে ভাগ হয়ে না গেলে সবার খাবার জুটত না ওখান থেকে।

পানির মধ্যেও ওরকম খাদ্যের চেইন সুস্পষ্ট। সমুদ্রে প্ল্যাঙ্কটন নামক অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ থাকে প্রচুর, আর থাকে একই নামের অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনরা খাবার তৈরি করে। প্রাণী প্ল্যাঙ্কটনরা উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে বাঁচে। ঝাঁক বেঁধে যে সব ছোট ছোট মাছ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, তারা বেঁচে থাকে এই প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে। বড় বড় মাছ এ সব ছোট মাছ খায়—তাদের সংখ্যা স্বল্পতর।

অনেকগুলো খাদ্যের চেইনেই সর্বোচ্চে রয়েছে মানুষ—কারণ মানুষের খাদ্য গ্রহণে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। পরজীবীদেরকেও এই খাদ্য চেইন থেকে বাদ দেয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে অনেক ছোট ছোট পরজীবী একটি মাত্র বড় প্রাণীর উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করছে—যেমন পেটের কৃমি। ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলো এক সময়ে মানুষের রক্তে পরজীবী। এরাই আবার আর এক পর্যায়ে মশার পেটে পরজীবী। অথচ মানুষের খাদ্য চেইন ও মশার খাদ্য চেইন দুটা আলাদা জিনিস। কাজেই এ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দুটি চেইনের মধ্যে পাশাপাশি যোগসূত্র দিচ্ছে।

একটা বিশেষ জায়গার বিভিন্ন খাদ্য চেইনগুলোর মধ্যে পরিবেশগত সম্পর্ক রয়েছে এবং এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। বিড়াল কয়টা ইঁদুর খাচ্ছে প্রকারান্তরে তাই আবার শষ্যের ফলনে প্রভাব রাখছে। হঠাৎ করে চেইনের এক সদস্যের সংখ্যায় বা কাজে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে তাতে পুরো নিয়মটাই যায় ভেঙ্গে। একের উপর অন্যের প্রভাবের এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য যে বিদ্যা তাকে বলে ইকোলোজী বা পরিবেশবিদ্যা।

চেইনের উপরের দিকে এমন কিছু বড় বড় প্রাণী থাকে, যাদের আর কেউ মেরে খেতে পারে না। যেমন সিংহ বা হাতী। কিন্তু সেখানে কি খাদ্য চেইন শেষ হয়ে যায়? মোটেই না। রোগে বা বার্ধক্যে মারা পড়লে তাদের দেহও ছোট বড় বহু প্রাণীর দৃষ্টি এড়ায় না। হায়েনা, শকুন থেকে শুরু কর ছোট্ট গুবরে পোকা পর্যন্ত তখন তাদের সদ্ব্যবহার করে। এর অংশবিশেষ অবশ্য ব্যাকটেরিয়ার আওতায় পড়ে। তারা একে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে ফেলে গাছের সার হবার জন্য। সেই সার থেকে গাছ আবার বানায় খাদ্য। শুরু হয় একটা নতুন চেইন।

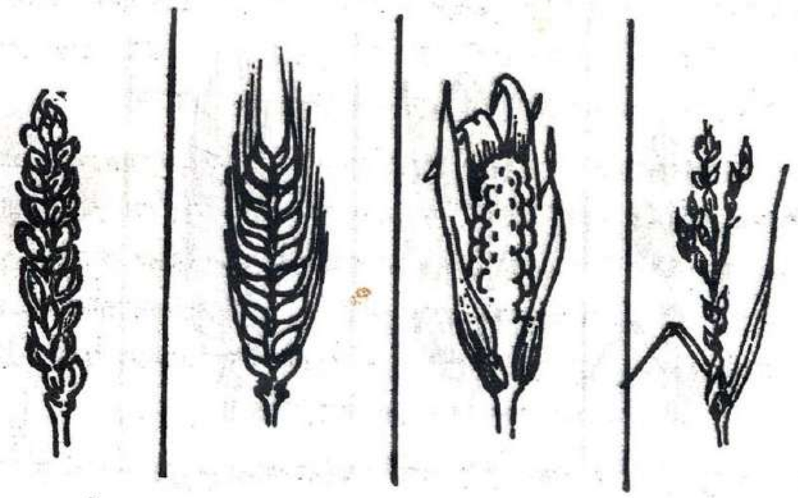

ঘাস

মাটিতে সবুজ ঘাস—প্রকৃতির একটি অতি সাধারণ পরিচয়। ঘাস বলতে আমাদের বাড়ীর সামনে, মাঠে-ঘাটে, সর্বত্র অযত্নে লালিত দুর্বা প্রভৃতি ঘাসকেই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু আজ আরো ব্যাপক অর্থে ঘাসের কথাই বলবো। উদ্ভিদ-বিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘাস বলতে অনেক কিছুকে বোঝায়। শুনে অবাক হয়ে যাবে যে, মানব-জাতির জন্য যেসব উদ্ভিদ প্রয়োজন তার মধ্যে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। হবেই না বা কেন, এর মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রায় সবগুলো দরকারী শস্য—ধান, গম, ভুট্টা, বজরা, ওট, বার্লি সব কিছু। আখও ঘাস। আবার অন্যদিকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের মুল্যবান নির্মাণ সামগ্রী বাঁশও তাই। এরা সবাই বৃহৎ ঘাস পরিবারের সদস্য, উদ্ভিদ-বিদ্যার ভাষায় যে পরিবারকে বলা হয় 'গ্রামিণী'। অন্তত খাদ্যের জন্য মানব জাতি মূলত ঘাসের উপর নির্ভর করছে এ কথা না বলে উপায় নেই। আবার গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী থেকে আমিষ যখন খাই তখনো কার্যত ঘাসের উপর নির্ভর করি, কারণ ওরা আবার প্রধানত তৃণভোজী।

বাঁশ কিন্তু ঘাসের একটি চরম উদাহরণ, অনেক লম্বা ও বেশ শক্ত। বেশির ভাগ ঘাস তোমার ধারণা মতোই—নরম, বেঁটে। সাধারণ ঘাসকে গরু ছাগলে খেয়ে, বা আমরা ছেঁটে সবসময় মুড়িয়ে রাখি। কিন্তু ঘাসের একটা চমৎকার গুণ আছে, যা তাকে এই সার্বক্ষণিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ঘাসের মূল দণ্ডের গোড়া থেকে অসংখ্য নতুন নতুন পার্শ্ব দণ্ড গজায়। উপর থেকে মুড়িয়ে দিলে এই পার্শ্বদণ্ড গজানোর ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয়। কাজেই যতই গরুতে খাক না কেন ঘাসের আবার তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে অসুবিধা হয় না।

ঘাসের শিকড়গুলো গুচ্ছে বের হওয়া সূতার মতো। এই শিকড়ের খুব ঘন জাল মাটির ভেতরে চলে গিয়ে মাটিকে খুব ভালভাবে আঁকড়ে থাকে। বাগানে ঘাসের চাপড়া লাগানোর সময় মাটি-শিকড় শুদ্ধ

আনা চাপড়া খেয়াল করে দেখলেই তুমি এটা বুঝতে পারবে। এর একটা খুব ভাল ফল হয়েছে। যেখানে মাটির উপর ঘাস আছে সেখানকার মাটি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হতে পারে না। এজন্য উঁচু মাটির রাস্তা, বাঁধ বা পুকুর পাড়কে রক্ষা করার জন্য তার উপর ঘাস থাকা ভাল। আমাদের দেশের সবুজ ঘাস মাটিকে সর্বনাশী ক্ষয় থেকে অনেকখানি রক্ষা করছে। উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ সমভূমিতে এক সময় প্রচুর ঘাস ছিল। আবাদ করতে গিয়ে সে ঘাস যখন বিলুপ্ত করা হলো, বছরের পর বছর ধরে উপরের উর্বর মাটি সরে গিয়ে এখন সেখানে অনেক জায়গায় 'ধুলো-বাটি' বলে অভিহিত রুক্ষ জায়গার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘাসের কাণ্ড সাধারণত ফাঁপা হয়, অবশ্য পাতার সংযোগস্থল ছাড়া। শুকিয়ে যাবার পর খড় হিসেবে এর নানা ব্যবহার রয়েছে। ছাউনী, বোর্ড তৈরি, বিভিন্ন উপকরণ বুনতে এর ব্যবহার প্রচুর। ঘাসের পাতাগুলো চ্যাপটা ফিতার মতো—এরা পর পর কাণ্ডের দু'পাশ থেকে বের হয়। একটা এপাশে হলো তো পরেরটা ওপাশে। পাতার নিচের অংশ কাণ্ডকে আবৃত করে রাখে এবং এই আবরণের অংশ ও পাতার উপরের অংশের মাঝখানে লিগিউল নামে একটা কলারের মতো জিনিস থাকে। এ জিনিসগুলোই ঘাসকে ঘাস হিসেবে চিনতে সাহায্য করে। ঘাসের ফুল আসে ফুল-গুচ্ছের আকারে পরাগ সংযোগ হয় বাতাসের দ্বারা উড়ে গিয়ে। এর যেসব বীজ তার অনেকগুলোই শর্করা ও ভিটামিনে খুব সমৃদ্ধ—আর এদের উপরেই আমরা পুরো মানবজাতি নির্ভর করি।

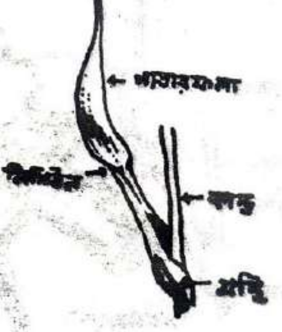

আখ থেকে চিনি

আখ খেতে তুমি ভালবাস্। আখের ক্ষেতও হয়ত দেখেছ। যদিও এমনিতে কিছু আখ মানুষ চিবিয়ে বা রস বের করে খায়, এর প্রধান ব্যবহার কিন্তু চিনি উৎপাদনে। খাবার-দাবার তৈরিতে চিনির যে কত ব্যবহার তাতো তুমি জান। তাই আখ থেকে কেমন করে এই সুন্দর চিনির দানা পাওয়া যায়, তা জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে।

আখ প্রায় দশ-বারো ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। একেবারে গোড়া থেকে কেটে নিয়ে, কয়েক টুকরা করে আখকে চিনিকলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের দেশের রংপুর অঞ্চলে প্রচুর আখ হয়, চিনি কলও উত্তরাঞ্চলে বেশী। চিনিকলগুলো আখের খেতের কাছে হওয়া দরকার, কারণ কাটার পর আখ বেশ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। কলের মধ্যে প্রথমে যান্ত্রিক ছুরি এবং পেষণ যন্ত্র বাইরের ছোবড়া ভেদ করে ভেতরের রস বের করার সুযোগ করে দেয়। তারপর একের পর এক বেশ কিছু রোলার রস নিংড়ে নেয়। আখের ছোবড়াও ফেলনা নয়, এটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য ব্যবহারও এর আছে।

আখের রসে কি থাকে? এতে আখের গুণ অনুসারে শতকরা আট থেকে একুশ ভাগ চিনি থাকে। আড়াই ভাগের মতো অন্যান্য জিনিস থাকে। বাকী সব স্রেফ পানি। অদরকারী মিশ্রিত জিনিসগুলো চুনের সাহায্যে গাঁদের আকারে বের করে ফেলা হয়। এরপর চলে পানির ভাগ বাষ্প করে উড়িয়ে দিয়ে রসকে ঘন করার কাজ। ঘন রসকে বায়ুশূন্য পাত্রে গরম করে চিনির বাদামী কেলাস আর ঘন তরল মোলাসেস (চিটাগুড়) আলাদা করে ফেলা হয়। সেন্ট্রিফিউজ নামক যন্ত্র খুব জোরে ঘোরালে সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়ে মোলাসেস বের হয়ে যায় আর চিনির দানা এতে থেকে যায়। প্রথম জিনিসটা দিয়ে আমাদের দেশে হুকার তামাক তৈরি করা হয়, গরুকে খাওয়ানো হয়। বিদেশে এর থেকে মদ জাতীয় পানীয় তৈরি করা হয়।

বাদামী রঙের চিনিকে বারবার দ্রবীভূত ও শোধন করে এর থেকে অবশিষ্ট অদরকারী জিনিসগুলোও বের করে ফেলা হয়। এই চিনির বাদামী রংটা সাদা করার জন্য কাঠ-কয়লার গায়ে এর দ্রবণ শোষণ করাতে হয়। কাঠ-কয়লার একটা সুন্দর গুণ হলো এটা রঙের উপাদানগুলো এর গায়ে শোষণ করে নিতে পারে। অবশেষে বায়ুশূন্য পাত্রে খুব সতর্কভাবে কেলাসিত করে সাদা চিনির পরিষ্কার দানা পাওয়া যায়।

যদিও দুনিয়ার বেশীর ভাগ চিনি এবং আমাদের দেশের সব চিনি আখ থেকে তৈরি হয়, তবুও কোন কোন শীতপ্রধান দেশে বীট থেকেও চিনি তৈরি হয়। বীট হলো মূলা-গাজর জাতীয় সব্জী। কালচে লাল রঙের যে সব্জী সালাদ বানাতে ব্যবহৃত হয় সে-ই বীট। এই বীটেরই একটি বিশেষ জাত আছে যা থেকে বেশ ভাল চিনি তৈরি হতে পারে। মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্মানিতে বাইরে আখ উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে চিনি আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেখানে বীট থেকে চিনি তৈরির কায়দাটি আবিষ্কৃত হয়।

ছিপির ছোট কর্কটি

তাকে তুমি রোজ দেখছ—বাসায় আচারের বোতল, তেলের শিশি, ওষুধের বোতল—প্রায় সব কিছুর মুখ তাকে দিয়ে বন্ধ করা। বোতলের মুখের সেই ছোট্ট কর্কের ছিপিটা, যেটা অনায়াসে হারিয়ে যায়, তাকে নিয়েও যে কিছু চিন্তা-ভাবনা করা যায়, এ নিশ্চয় তুমি ভাব নি। এই সাধারণ জিনিসটার কিন্তু এমন সব গুণ রয়েছে যার জন্য যুগ যুগ ধরে এটা সারা দুনিয়ায় নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে—ছিপি হিসেবে তো বটেই। ইতিমধ্যে রাবার, প্লাস্টিক বহু জিনিসের বহু উন্নতি হলেও কর্কের চাহিদা কিন্তু বেড়েছে বৈ কমে নি।

কর্ক হচ্ছে গাছের ছালে থাকা জিনিস, যা প্রায় সব গাছই নিজের দেহের চার দিকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তৈরি করে। যে কর্ক আমরা ব্যবহার করি, সেটা অবশ্য 'কর্ক ওক' নামক একটা বিশেষ গাছের ছাল। এই গাছের বৈশিষ্ট্য হলো ঃ এর ছালের কর্ক বছরের পর বছর ধরে জমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট পুরু হয়ে যায়। তোমরা হয়ত জান যে, গাছের দেহের সবগুলো অংশই খুব ছোট ছোট জীব-কোষে তৈরি—অণুবীক্ষণের তলায় যাদের দেখা যায়। কর্ক উৎপাদন করার জন্যও এ রকম বিশেষ কিছু কোষ-রয়েছে গাছের গায়ে। এই কোষগুলোর দেয়ালের উপরই কর্ক জমে এবং পরে কোষগুলো মরে শুকিয়ে

গেলে তার ভেতরটায় শুধু বাতাস ছাড়া আর কিছু থাকে না। প্রথমবার ছাল তুলে ফেলার পর কর্ক ও গাছ প্রতি বছরে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ পুরু হয়ে কর্ক জমে। প্রতি নয় বছর অন্তর এর ছাল খুলে কর্ক নিয়ে নেয়া হয়। একে ঘন্টা খানেক সেদ্ধ করে নিলেই তোমার কর্ক তৈরি—বিভিন্ন কাজের জন্য এবার প্রয়োজনমত কেটে নিলেই হলো।

যেহেতু কর্ক কোষগুলোর ভেতরটা একেবারে ফাঁপা, বাতাস ছাড়া কিছুই নেই, সে কারণে কর্ক খুবই হালকা জিনিস। চাপ দিলে ফাঁপা কোষগুলো চুপসিয়ে গিয়ে কর্ক আয়তনে ছোট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ছেড়ে দিলেই এটা আবার আগের আয়তনে ফিরে যাবে। এর ফলে ধাক্কা সামলাবার কাজে কর্কের জুড়ি নেই। কর্কের কোষগুলো এমন ঘনভাবে সংঘবদ্ধ যে, এদের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। এর ভেতর দিয়ে তরল পদার্থ চুইয়ে যেতে পারে না। এই কারণে ছিপি হিসেবে বা পাম্প, তেলের নল ইত্যাদিকে নিশ্ছিদ্রভাবে আটকাবার জন্য কর্ক ব্যবহার করা হয়। এভাবে ব্যবহৃত হতে কর্কের আরেকটা মস্ত সুবিধা হলোঃ বেশীর ভাগ জৈব তরল পদার্থ কর্কের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বেনজিন, ইথার ইত্যাদি তরল কর্কের সাথে কোন রকম বিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, অথচ রাবারের ছিপি ব্যবহার করলে এরা কিছু দিনের মধ্যেই ছিপির নিম্নাংশ খেয়ে ফেলে। একেবারে স্বাদ-গন্ধবিহীন এবং বিক্রিয়াহীন হওয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের বোতলে ছিপি হিসেবেও কর্কের সুবিধা বেশি। তা ছাড়া এমনিতে নরম মনে হলে কি হবে, কর্কের কোষ দেয়ালগুলো কিন্তু খুবই শক্ত। পিঁপড়া, তেলাপোকা জাতীয় পোকা-মাকড়ের কম্মো নয়, এটা ভেদ করে ঢুকে। খাবার দাবার রাখতে সেটাও মস্ত সুবিধা।

একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে। গাছের ছালে যখন কর্ক থাকে তখন এতে আড়াআড়ি কিছু সূক্ষ্ম নল থাকে—বাকলের ভেতরের জীবকোষগুলো যাতে বাতাস নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। কাজেই ছিপি তৈরির সময় কর্ককে এমনভাবে কাটতে হয় যেন এই সূক্ষ্ম নলগুলো ছিপিতে লম্বালম্বি না থেকে আড়াআড়ি থাকে। তা নইলে এই নল বেয়ে কিছু তরল চুয়াতে পারে।

কোষগুলোর ফাঁপা হওয়ার ফলে শব্দ এবং কাঁপুনি বন্ধ করার জন্য কর্ক বেশ উপযোগী। খুব বড় বড় মেশিনকেও যদি কর্কের তৈরি প্যাডের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, তবে তার ঘর্ ঘর্ কাঁপুনি দালানের অন্য কোন অংশে বোঝা যাবে না। কর্কের কোষগুলোর যে দেয়াল তার তাপ পরিবহন ক্ষমতা খুব কম। আর কোষের ফাঁপা ভেতরটায় বদ্ধ যেই বাতাস তারও এই ক্ষমতা খুব কম। এই দুয়ে মিলে কর্ককে খুব ভাল তাপ নিরোধক ক্ষমতা দিয়েছে। তাইতো গরম কেতলী রাখার জন্য যে টেবিলম্যাট তাতে যেমন কর্কের ব্যবহার দেখ, আইসবক্সে বরফ অনেকক্ষণ ধরে রাখার জন্যও তেমনি তাকে কর্ক দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। কর্কের আর একটা গুণ হলো ঃ এতে সহজে আগুন ধরে না। গরম জিনিসের সাথে ব্যবহার করতে এটাও একটা মস্ত সুবিধা।

তাপ নিরোধী অন্যান্য জিনিসের একটা দোষ হলো, এরা প্রায়ই পানি শুষে নেয়—যেমন কাগজ, ফেল্ট প্রভৃতি। কর্কের এই দোষটা নেই। নিত্য পানির সংস্পর্শে থাকলেও এটা পানি বড় একটা শোষণ করে না– তার ভেতর ফাঁপা হওয়া সত্ত্বেও।

কর্কের সর্বপ্রাচীন যে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হলো দু'হাজার বছরেরও বেশি আগে প্রাচীন গ্রীকদের লেখায়। সেখানে মাছ ধরার জাল পানিতে ভাসিয়ে রাখার কাজে কর্কের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যবহার অবশ্য আজও পূর্ণ মাত্রায় বজায় রয়েছে।

প্রকৃতিতে গাছ থেকে যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সে অবস্থাতেই যে শুধু কর্ককে ব্যবহার করা হয় তা নয়। মাত্র ইঞ্চি খানেক পুরু হয় বলে এভাবে সব রকম আয়তনের জিনিস কর্ক থেকে তৈরি সম্ভব নয়। সে জন্য আজকাল 'জমানো কর্ক'ও ব্যবহার করা হয়। এতে গাছ থেকে ছিলে নেয়া কর্ককে খুব ছোট ছোট টুকরো করে কুরিয়ে ফেলা হয়, নারকেল কোরানোর মত করে। টুকরার আয়তন নির্ভর করবে কি ধরনের 'জমানো কর্ক' চাচ্ছি তার উপর। কোরানোর সময় অবশ্য কর্কের ক্ষুদ্র কোষ গঠনসমূহের কোন ক্ষতি হয় না—কারণ প্রতি টুকরো কর্কের মধ্যে তখনও হাজার হাজার কোষ থেকে যায়। কোরানো কর্ককে প্রয়োজনীয় ছাঁচে ঢেলে একে গরম করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্ক থেকে প্রাকৃতিক আঠা জাতীয় রেজিন এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থগুলো বের হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। এবার ঠাণ্ডা করলেই রেজিনের সাহায্যে কর্কের টুকরোগুলো জমাট বেঁধে 'জমানো কর্কে' পরিণত হয়। ইচ্ছেমত আকারের ছাঁচ ব্যবহার করে এই ভাবে যে কোন আকারের ও আয়তনের কর্ক পাওয়া যায়।

গাছের ছালে কর্ক জাতীয় জিনিস তুমি নিজেও হয়ত খেয়াল করে থাকবে। তবে ঠিক কর্ক ওক' যেই গাছটি সেটি খুব সম্ভব তুমি দেখ নি। প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে পর্তুগালে এ গাছটির চাষ করা হয়। কর্ক গাছ না দেখলেও কর্ক তুমি অবশ্যই দেখেছ। এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে একটা কর্কের ছিপি নিয়ে এসে আবার ভাল করে দেখ এই হাল্কা অথচ নানা গুণের জিনিসটাকে।

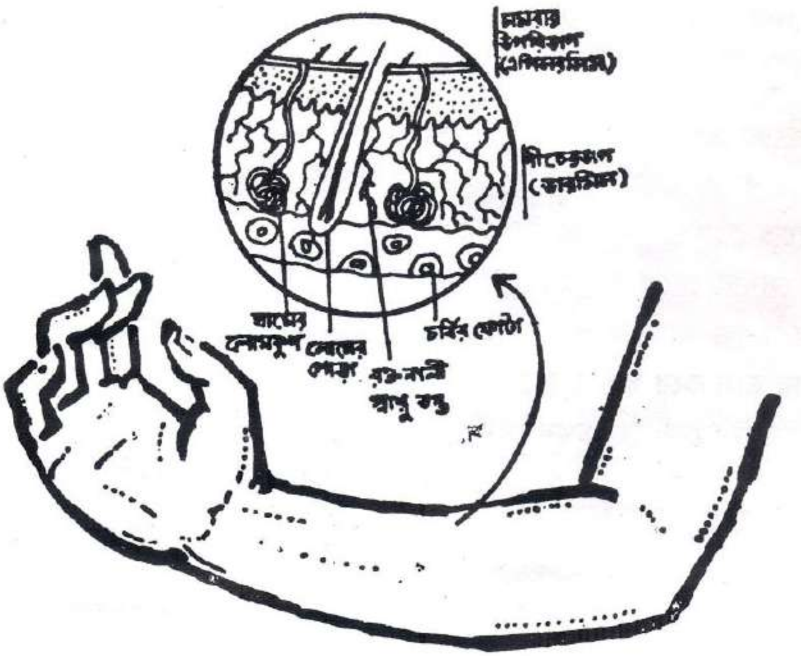

তোমার চামড়ার নানাকাজ

ছোটবেলা থেকে মা বরাবর তাড়া দিয়ে আসছেন—হাত মুখ সব সময় পরিষ্কার রাখতে, গোসলের সময় ভাল করে রগড়ে গায়ের চামড়া পরিষ্কার করতে। চামড়াটি কি শুধু শরীরের বাইরের আবরণ মাত্র? যেমনটি তোমার নতুন বইয়ের মোড়ক? মোটেই নয়। চামড়ার গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাই তো তার এতো যত্ন। আবরণের কাজটিও অবশ্য চামড়া খুব ভালভাবেই করে। রোগ জীবাণু, বাইরের ঝড়-ঝাপটা ইত্যাদি থেকে শরীরকে এটা চমৎকারভাবে রক্ষা করে।

ধরো ব্লেডে হাত কেটে ফেললে। সাথে সাথে তোমার চামড়া কাজে লেগে যায় কিভাবে একে সারানো যায়। চামড়ার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালী। সেখান থেকে ক্ষতের চারদিকে রক্ত এসে এর ময়লা ও জীবাণু ধুয়ে দিয়ে যায়। তার পরপরই রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে রক্তপাত কমে আসে, রক্ত জমে গিয়ে আঠার মত ক্ষতের দু'পাশকে জোড়া দিয়ে রাখে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সূতার মত কোষতন্তু চারদিক থেকে জন্ম নিয়ে ফাঁকটুকু ভর্তি করে দিতে চায়। এবার দু'দিক থেকে চামড়ার উপর দিককার কোষগুলো বাড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষতটা জোড় নিচ্ছে। এসব কাজ করার জন্য চামড়া নিজেই যেন একটা সুসজ্জিত হাসপাতাল। শুধু তাই নয়, দরকার পড়লে ব্লাড-ব্যাংকের কাজও চামড়া করে থাকে। প্রয়োজনে কাজে লাগার জন্য রক্ত যেখানে জমা রাখা হয় তাকেই তো বলে ব্লাড-ব্যাংক। ধরো কেউ অতর্কিতে তোমাকে আক্রমণ করলো। তখন হয় তোমাকে লড়তে হবে, নয় পালাতে হবে—এবং উভয় ক্ষেত্রে হঠাৎ দুর্ভাবনা পোহাতে হবে। এর জন্য শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গা চট করে অতিরিক্ত রক্ত দাবি করে বসবে। প্রশস্ত শর্টকাট রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে এই রক্ত যোগান দিতে পারে তোমার চামড়া। তাই বিপদে

পড়লে বা ভয় পেলে মানুষকে ফ্যাকাসে দেখায়। চামড়া থেকে রক্ত অন্যত্র চালান হয়ে যায় বলেই চামড়া সাদা হয়ে পড়ে।

তোমার শরীরের উষ্ণতা সব সময়েই স্বাভাবিক অর্থাৎ ৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইটে থাকার চেষ্টা করে। তোমার চামড়া এ কাজে অনেক সহায়তা করে। খুব বেশী কাজ করার দরুন বা জ্বর উঠলে অথবা অন্য কোন কারণে হয়ত তোমার শরীরের উষ্ণতা এর উপরে উঠে গেল। রক্তের মাধ্যমে এ খবর যেই মস্তিষ্কে পৌঁছবে অমনি সেখান থেকে স্নায়ুর নির্দেশ আসবে চামড়ার রক্তবহ নালীগুলো যাতে আরো প্রশস্ত হয়ে পড়ে। ফলে বেশী রক্ত চামড়ার কাছে দিয়ে বইবে আর চামড়ার মাধ্যমে বাইরের বাতাসের কাছে তাপ হারাবে। হাওয়ায় ভাল করে ছড়িয়ে দিলে সব কিছু জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয় এতো তোমরা জান। পেয়ালার চায়ে যখন মুখ পোড়ার উপক্রম হয় তখন পিরিচে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি এ কাজটিই করো। চামড়া যেন ঠাণ্ডা করার জন্য রক্তকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে চামড়াকে একটু রক্তিমও দেখায় এ রকম জ্বর বা অন্য কোন রকম উষ্ণতার অবস্থায়। আর শীতে যদি শরীরের উষ্ণতা কমে যায়, তা হলে ঠিক উল্টো নির্দেশ আসে মাথা থেকে। চামড়ার রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে রক্ত চামড়া থেকে দূরে সরে যায়—ফলে ঠাণ্ডা কম হয়। চামড়াও তাই শীতের মধ্যে একটু ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

খুব বেশী ঠাণ্ডা লাগলে চামড়ার আরেকটা মজার কাণ্ড হতে তুমি হয়ত খেয়াল করেছ। চামড়া কুঁচকে লোমের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু গোটার মত হয়ে উঠে আর লোমগুলো খাড়া হয়ে যায়। এটি খানিকটা মানুষের পূর্ব ইতিহাসের ফল। আমাদের পূর্বপুরুষ বনমানুষদের ছিল সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম। চামড়ার পেশী সঙ্কুচিত করে, সে লোমগুলোকে খাড়া করে ফুলিয়ে নিলে তাতে বাতাস আটকে গা গরম রাখা যেত। সেই অভ্যাসটাই যেন আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, যদিও কাজে আসার মত তেমন কিছু লোম এখন আমাদের নেই। পশু পাখির মধ্যে এভাবে লোম বা পালক ফুলিয়ে শীত ঠেকাতে হয়ত তুমি দেখেছ।

শরীর ঠাণ্ডা রাখার আরেকটা কায়দা চামড়ার মাধ্যমে রয়েছে—তা হলো ঘাম উৎপাদনের মাধ্যমে। গরমের দিনে তুমি বেশী ঘাম, এই ঠাণ্ডা হওয়ার তাগিদ থেকেই। মানুষের সারা গায়ে চামড়ায় ছড়ানো রয়েছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোমকূপ। এরা চামড়ার ভেতরকার খুব সরু প্যাঁচানো নল, যার মধ্যে শরীরের পানি ও লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ এসে জমে। এরা হরদম চামড়ার উপরে উঠে আসছে—আর বাতাসে শুকোচ্ছে। এই শুকানোর মাধ্যমে শরীরটাও ঠাণ্ডা হচ্ছে। হাতটা পানিতে ভিজিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে তা ধরো, দেখো কি রকম ঠাণ্ডা লাগে। ঘাম শুকোলেও তাই হয়। কুকুর কিংবা অন্যান্য লোমশ প্রাণীর কিন্তু এরকম অসংখ্য লোমকূপ নেই। ফলে বেচারাদের এত ঘামও হয় না আর তারা ঘাম শুকিয়ে ঠাণ্ডাও হতে পারে না। এই জন্যই কুকুর গরমের দিনে জিহ্বা বের করে লালা ঝরায় আর হাঁপায়। মুখের পানি শুকিয়েই সে এভাবে শরীরটা কিছু ঠাণ্ডা করে।

খুব বয়স হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের চামড়া বেশ টান টান থাকে। এই টানে সামান্য একটু রদবদল হলেই আমরা তা টের পাই—তাকেই আমরা বলি স্পর্শ অনুভূতি। অনেক কীটপতঙ্গ খোলস

বদলায়। মানুষও কি বদলায়? হ্যাঁ বদলায় বৈকি, তবে ওদের মত চট করে নয়, খুব ধীরে ধীরে। প্রতি মুহূর্তে অদৃশ্যভাবে আমাদের চামড়ার উপরিভাগ ক্ষয় হচ্ছে আর তার জায়গায় নিচের থেকে নতুন চামড়া গজাচ্ছে। সব সময় নতুন নতুন চামড়া তৈরি হলেও তোমার চামড়াটি কিন্তু তোমার একেবারেই নিজস্ব। যেমন তোমার আঙ্গুলের ছাপের সাথে অন্য কারো ছাপ মিলবে না। এই জন্য যারা নাম স্বাক্ষর করতে পারে না, তাদের জন্য দলিলপত্রে আঙ্গুলের ছাপ নিলেও কাজ চলে। ক্ষয় গিয়ে বা অন্য কোনভাবে আঙ্গুলের চামড়ার বাইরের দিকটা যদি নষ্টও হয় তাহলেও কিছু আসে যায় না। কারণ ছাপের এই প্যাটার্নটি রয়েছে চামড়ার ভিতরের অংশে। যতবার উপরের চামড়া নতুন গজাবে ততবার ভেতরের অংশ থেকে একই রকম প্যাটার্ন সেটা পাবে।

এক এক দেশের মানুষের চামড়ার রঙ এক এক রকমের হয়। শুধু তাই নয়—একই ঘরে ভাই-বোনদের মধ্যেই অনেক সময় গায়ের রঙের কিছুটা তফাত হয়ে যায়। চামড়ার মধ্যে ম্যালানিন নামক এক প্রকার রঞ্জন পদার্থই চামড়াকে এর রঙ দিয়ে থাকে। এটার পরিমাণ বেশি হলে রঙ গাঢ় বা কালো হবে, আর পরিমাণ যতই কম হবে রঙ তত ফর্সা হবে। মাঝে মাঝে আমাদের দেশেও দু'একটা শিশু জন্ম নেয় যাদের চামড়ায় ম্যালানিন মোটেই থাকে না। তাদের শরীর খুব সাদা হয়—এমনকি চোখের ভুরু, মাথার চুল পর্যন্ত। তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই হয়ত কেউ কেউ এ রকম আছে। শুধু চামড়ার ম্যালানিনের হেরফেরের জন্য এসব তফাত হয়ে থাকে—এটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।